অধ্যায় ১৪

জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং টেকসই পরিবেশ

অধ্যায় ১৪

জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং টেকসই পরিবেশ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ পরিবেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ ও অণুজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
- ☑ মানুষের জীবনে অণুজীবের ব্যবহার ও উপযোগিতা
- ☑ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জীবজগতের সংকট
- ☑ বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর এর প্রভাব

সাদাচোখে আমরা যেমন জীব আর জড়কে আলাদা করে দেখি, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় বিষয়টা অত সরল নয়। আমরা যাদের জীব বলি, যারা চলতে ফিরতে পারে, খাবার গ্রহণ করে, তাদের গঠন খেয়াল করলেও দেখবে—বিভিন্ন অজৈব অণু অর্থাৎ জড় উপাদান দিয়েই তারা তৈরি! আবার জীবের সংজ্ঞাও সব সময় অত স্পষ্ট নয়। যেমন—ভাইরাসের দিকে যদি তাকাও, ভাইরাসকে জীব বা জড়ের কাতারে ফেলা খুব মুশকিল, কারণ পোষক দেহে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ভাইরাসের আচরণ যা দেখা যায় তাতে তাকে জড় বলাই বেশি সংগত। ঠিক কীভাবে অসংখ্য জড় উপাদান একত্র হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই, বিজ্ঞানীরা তাই দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে গবেষণা করছেন। তোমরা উপরের শ্রেণিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত জানতে পারবে!

জীবজগৎ এবং জড় উপাদানের সম্পর্কটি একটি চক্রের মতো। যখন নতুন জীব জন্ম নেয়, তখন সেই জীবের শরীরে পরিবেশের বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব এবং অজৈব উপাদান সঞ্চিত হয়। এই জীবটি যখন মারা যায়, তখন আবার সেই জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলো পরিবেশে ফিরে যায়। পরবর্তীকালে আবার কোনো জীবের ভেতর সঞ্চয়ের আগ পর্যন্ত তারা পরিবেশে জৈব এবং জড় উপাদান হিসেবে বিরাজ করতে থাকে।

কোনো একটি অঞ্চলের জীবজগৎ এবং সেই পরিবেশের সকল জড় উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে যে সিস্টেম গড়ে ওঠে, তাকে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বলা হয়।

ইকোসিস্টেম সাধারণত একটি অঞ্চলভিত্তিক হয়। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি প্রত্যেক ইকোসিস্টেমের দুই ধরনের উপাদান রয়েছে—জীবজ উপাদান এবং জড় উপাদান।

জীবজ উপাদানের ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। আর জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, আলো, পানি, অক্সিজেন, মাটি ইত্যাদি।

১৪.১ জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই জীবজগতের অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী সবাই একে অপরের ওপর নির্ভর করে। অণুজীব সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে হতে পারে তারা বুঝি আমাদের নানান রোগব্যাধি তৈরি করে কেবল আমাদের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু অনেক অণুজীব রয়েছে যারা আমাদের উপকার করে। যেমন—দইয়ের সঙ্গে আমরা যেসব ব্যাকটেরিয়া খাই তারা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী। আমাদের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ অ্যান্টিবায়োটিকের উৎস হচ্ছে কিছু ছত্রাক (fungi)। ভাইরাস ব্যবহার করে আমরা প্রাণঘাতী নানান অসুখের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করি। যেমন—পোলিও অসুখটির কথা হয়তো তোমরা শুনে থাকবে। এই অসুখ হলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আমরা পঙ্গুত্ব বরণ করি। এই রোগের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করা হয় ভাইরাস ব্যবহার করে।

অণুজীব উদ্ভিদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে

যারা উদ্ভিদকে পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানীরা পাটের পাতা এবং কাণ্ডেও বিভিন্ন ধরনের অণুজীব পেয়েছেন যারা পাটের বৃদ্ধি ও টিকে থাকার জন্য সহযোগিতা করে।

উদ্ভিদের ওপর সমগ্র জীবজগৎ নির্ভর করে। কারণ, আমরা জানি যে, সব সবুজ উদ্ভিদই নিজেরা সূর্যের আলো ব্যবহার করে শর্করা উৎপাদন করে। এই শর্করায় জমা হওয়া শক্তি পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জৈব অণুতে প্রবাহিত হয়। এভাবে সূর্য থেকে আসা আলোকশক্তি বিভিন্ন রূপে অন্যান্য জীবে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের কাছ থেকেই পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে অণুজীব। এ ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদেরকে পচন করিয়ে প্রকৃতিতে বিভিন্ন উপাদান ফিরিয়ে দেয় এই অণুজীবেরা।

প্রকৃতিতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের মধ্যকার পুষ্টির এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে খাদ্যচক্র (food cycle) বলে। এই চক্রের মূল বিষয় হচ্ছে—প্রকৃতিতে এক জীব আরেক জীবের খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। পৃথিবীর খাদ্যচক্রে মানুষের অবস্থান একেবারে উপরের দিকে এবং তাদের খাদ্যভ্যাস ও এই সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিবেশের অন্যান্য জীবের ওপর বড় রকমের প্রভাব ফেলে।

ছবি: প্রকৃতিতে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক চক্রাকারে চলতে থাকে।

১৪.২ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের ভূমিকা

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে (ecosystem) মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যেহেতু খাদ্যচক্রের সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ও প্রভাব বিস্তারকারী, তাই তার আচরণের প্রভাব জীবজগতের সকলের ওপর পড়ে। বাস্তুতন্ত্রের কেবল জীব উপাদানই নয় বরং জড় উপাদানের ওপরও মানুষের প্রভাব রয়েছে। মানুষ এখন আগুন, পানি, বাতাসসহ পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানে প্রভাব ফেলছে। তারা কৃষির শিল্পায়ন করছে এবং পরিবহনের জন্য নানান যানবাহন, রাস্তাঘাট, সৌর প্যানেল ইত্যাদি তৈরি করছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বড় কৃষিখামার তৈরির জন্য যখন আমরা ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি ইত্যাদি একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করি তখন আমরা সেই স্থানের বাস্তুতন্ত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে ফেলি। কখনও কখনও, আমরা এমনকি একটি

বাস্তুতন্ত্রকে মূল ভিত্তি থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাই।

যখন কোনো বনের গাছ কাটা হয়, তখন বনভূমির বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তিত হয়। কারণ, বনের ওপর নির্ভরশীল প্রজাতিগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে চেষ্টা করতে হয় এবং স্থানীয় আর্দ্রতা এবং জলবায়ু উভয়ই পরিবর্তিত হয়। আবার, একটি বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর গতিপথ এবং পানির বণ্টনও পরিবর্তিত হয় এবং নদীর গতিপথ বরাবর বসবাসকারী প্রজাতিগুলো প্রভাবিত হয়।

এভাবেই মানুষের নানান কর্মকাণ্ড আমাদের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে, কাজেই এই মুহূর্তে মানুষের একটি বড় দায়িত্ব এই পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

পরিবেশ দুভাবে সংরক্ষণ করা হয়। একটি উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য সেসব সম্পদের ঘাটতি না হয়। যেমন—এখন কোনো কৃষক তার জমি চাষ করে ফসল ফলাচ্ছেন। এর ফলে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। যদি তিনি এমনভাবে কৃষিকাজ করেন যেন জমির উর্বরতা আবার আগের মতো হয়ে যায় এবং পরবর্তী বংশধরেরা ভবিষ্যতে চাষবাস করে তাঁরই মতো ফসল ফলাতে পারে, তাহলে জমির মাটি বা পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে বলা যায়।

আবার বিশেষ ক্ষেত্রে যখন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তির পথে যায় তখন সেগুলো আরও গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো জীব বা প্রাকৃতিক সম্পদ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ব্যবহার থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয়। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের খাদ্য এবং ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। যদি তাদের সংখ্যা বেশি পরিমাণে কমে যায় তখন তাদেরকে এইভাবে রক্ষা করতে হয়। সেক্ষেত্রে সেসব উদ্ভিদ, প্রাণী বা প্রাকৃতিক সম্পদ কেউ ব্যবহার করতে পারবে না এবং সেটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই সংরক্ষণ করতে হবে।

ছবি: আবর্জনা ফেলার সময় পচনশীল, অপচনশীল, ঝুঁকিপূর্ণ, ই-বর্জ্য ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী আলাদা করে ফেললে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। এই কারণে হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট ধরনের আবর্জনা ফেলার জন্য আলাদা আলাদা রংয়ের ডাস্টবিন রাখা থাকে

১৪.২.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

অবাঞ্ছিত বা অব্যবহারযোগ্য বস্তুগুলোকে বর্জ্য বলা হয়। কোনো বস্তু যখন আর ব্যবহারের উপযোগী থাকে না, অনাকাঙ্খিত স্থান দখল করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে তখন সেই সব বস্তু বর্জ্য হিসেবে গণ্য হয়। যেমন আমরা বাসায় যে কাচ, সিরামিক বা মেলামাইনের থালা, বাটি, গ্লাস ব্যবহার করি সেগুলো যদি ভেঙে যায় তাহলে বর্জ্য বা আবর্জনায় পরিণত হয়। এগুলো হচ্ছে কঠিন বর্জ্য। বাসার ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যদি নষ্ট হয়ে যায়

এবং মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তাহলে সেগুলো ইলেকট্রনিক বা ই-বর্জ্যে পরিণত হয়। রান্নার জন্য তরিতরকারি কাটার পর ব্যবহার অযোগ্য যে সকল অংশ ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলোও বর্জ্য। তবে সেগুলো পচনশীল এবং তা পচিয়ে জৈব সার উৎপন্ন করা যায়। আবার হাসপাতালে ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, অস্ত্রোপচারের পর ফেলে দেওয়া দেহের বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জৈব বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এগুলোকে মেডিকেল বর্জ্য বলা হয় এবং এগুলো সবচেয়ে ক্ষতিকর বর্জ্যের মধ্যে অন্যতম। আমরা চকলেট, বিস্কুট, বা চিপস খাওয়ার পর যে প্যাকেট ফেলে দিই তা অপচনশীল বর্জ্য এবং পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এজন্য এগুলো যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়।

বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী সেগুলোর ব্যবস্থা করার পদ্ধতি হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। যেমন—পচনশীল বর্জ্যগুলো পচিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে যা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। কাচ বা ধাতব বর্জ্য গলিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য নতুন দ্রব্য তৈরি করা যেতে পারে। এমন কিছু বর্জ্য আছে যেগুলো মানুষ জীবের জন্য এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয় অথবা মাটির নিচে এমনভাবে চাপা দিয়ে রাখা হয় যেন কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা মেনে চলতে হয়, তা হচ্ছে যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

১৪.২.২ সম্পদের অপচয় রোধ এবং টেকসই ব্যবহার

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য যেসব সম্পদ ব্যবহার করি, তা অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত। তাই দীর্ঘদিন সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য রাখতে হলে সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমরা যেসব সম্পদ ব্যবহার করি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাটি, পানি, বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি এবং খাদ্যদ্রব্য।

মাটি এমন একটি সম্পদ যা না হলে আমরা আমাদের কৃষিজ উৎপাদন করতে পারতাম না। এই মাটিও কিন্তু সীমিত সম্পদ। কোনো জমিতে একটানা কয়েক বছর একই ধরনের ফসল চাষ করলে সেই জমির উর্বরতা কমে যায়। কারণ, একেক ধরনের ফসলের জন্য মাটির একেক ধরনের খনিজ উপাদান বেশি দরকার হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে খনিজ উপাদান মাটিতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে। একটানা একই ধরনের ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসার সময় পায় না। ফলে ফসল উৎপাদনও কমে যায়। এমনকি অব্যবহৃত জমির ওপরে ঘাস বা অন্য গাছপালার আবরণ না থাকলে উপরের স্তরের উর্বর মাটি (top Soil) ক্ষয় হয়ে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

বিভিন্ন জীবের শরীরের একটি বড় অংশই হচ্ছে পানি। পানি না থাকলে উদ্ভিদ প্রাণী কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর বিপুল জলরাশির মধ্যে খুব সামান্য অংশ আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার কারণে প্রচুর পানি অপচয় হয় এবং এর ফলাফলস্বরূপ দরকারের সময় আমরা পানি থেকে বঞ্চিত হতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন কাজে যতটুকু পানি দরকার, ঠিক ততটুকুই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। গোসল করা,

ছবি: গাইবান্ধায় নবমির্নিত সৌরবিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র

গাড়ি ধোয়া, বাগান বা জমিতে পানি দেওয়া, বাথরুম ব্যবহারের সময় সঠিক মাত্রায় পানি ব্যবহার করা উচিত।

বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করে আমরা শক্তি উৎপাদন করি। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, কয়লা, জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এসব জ্বালানি একবার ব্যাবহার হয়ে গেলে পুনরায় ব্যবহার করার উপায় থাকে না। এজন্য এগুলোকে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি বলা হয়। এজন্য এসব জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় পরিহার করা উচিত। তবে বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদি বারবার ব্যবহার উপযোগী এবং এগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারলে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব।

যেকোনো জীবের বেঁচে থাকার জন্য পানির সঙ্গে খাদ্যও দরকার। পৃথিবীর অনেক স্থানেই মানুষ দৈনিক তিনবেলা খাদ্য জোগাড় করতে পারে না। খাদ্য উৎপাদন করতে জ্বালানিসহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফসল ফলাতে মাটির উর্বরতা ব্যবহৃত হয়, জমিতে সেচ কাজে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে জীবাশ্ম জ্বালানি কিংবা বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ফসল বা অন্য খাদ্যদ্রব্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে যে যানবাহন ব্যবহৃত হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হয়। তাই খাদ্যদ্রব্য অপচয় করা মানে অন্যান্য সম্পদেরও অপচয় করা। আমরা যদি সকল প্রকার সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারি তবেই একটি সুখি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

ছবি: কক্সবাজারে উইন্ড টারবাইন ব্যবহার করে বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে

১৪.৩ বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট ও আমাদের করণীয়

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের বাংলাদেশেও পড়েছে। আমাদের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানিদের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব, ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে তারা আগে ছয়টি ঋতুর পার্থক্য বুঝতে পারতেন। দেশের কৃষিকাজের জন্য কৃষকরা এই জলবায়ু এবং ঋতুর পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু এখন ঋতু পরিবর্তনের সেই নিয়মে খানিকটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন—বাংলা ক্যালেন্ডারের আষাঢ়, শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষাকাল হিসেবে বলা হলেও এখন আশ্বিন মাসেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা অসময়ের বন্যা ডেকে আনে। আবার আগে শীতকালে যতটা শীত অনুভূত হতো, এখন তেমনটা দেখা যায় না। আবহাওয়া ও জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদির প্রকোপ বেড়েছে।

বাংলাদেশে 'সিডর' নামে একটি বড় সাইক্লোন আঘাত হেনেছিল ২০০৭ সালের ১১ নভেম্বর। সেই সময়ে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি স্থলভাগের কৃষিজমি, মানুষের বাসস্থানকে প্লাবিত করেছিল। তারপর থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফসলি জমি, পুকুর, বাসস্থান ইত্যাদি লবাণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি উৎপাদন কমে গেছে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, এই প্রবণতা আরও বাড়তে থাকবে। স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক অঞ্চল পানির নিচে চলে যেতে পারে। এমনকি আমাদের সুন্দরবনের একটি অংশও স্থায়ী প্লাবনের শিকার হয়ে এখানকার জীবজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

দক্ষিণাঞ্চলে যেমন আমরা লবণাক্ততার সম্মুখীন হচ্ছি, অপরদিকে আমাদের উত্তরাঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে খরার প্রকোপ বাড়ছে। ফলে এখানেও কৃষি উৎপাদন কমবে এবং জীববৈচিত্র্যে পরিবর্তন আসবে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এর মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ছবি: সুমাত্রা গণ্ডার, একসময় বাংলাদেশে দেখা যেত। গোটা পৃথিবীতেই এরা এখন বিপন্ন।

ছবি: নীলগাই যা একসময় দিনাজপুর-পঞ্চগড় এলাকায় বিচরণ করত

ছবি: ডোরাকাটা হায়না, একসময় রাজশাহী অঞ্চলে দেখা যেত

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে ডোরাকাটা হায়েনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে ধূসর নেকড়ে, দিনাজপুর-পঞ্চগড় এলাকায় নীলগাই, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বান্টিং বা বনগরু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একসময় বনমহিষ দেশের সব বনাঞ্চলেই দেখা যেত। এ ছাড়া তিন ধরনের গণ্ডার ছিল বাংলাদেশে—সুমাত্রা গণ্ডার, জাভা গণ্ডার ও ভারতীয় গণ্ডার। বাদা বা জলার হরিণকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো বারো শিঙা হরিণ যা সিলেট ও হাওর এলাকায় দেখা যেত। কৃষ্ণষাঁড় নামে একটি প্রাণী পাওয়া যেত রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকায়। এদের সবই এখন বিলুপ্ত।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাওয়া দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয় একটি দেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি একটি বৈশ্বিক সংকট। পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলোর শিল্প-প্রযুক্তিগত কারণে এই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। কিন্তু আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পরিবেশ সংক্ষণের ব্যাপারে কাজ করতে হবে। একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিজেদের আচরণের দিক খেয়াল রাখা। অপ্রয়োজেন পৃথিবীর সম্পদের অপচয় না করে আমরা অবদান রাখতে পারি। পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার কমাতে পারি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে পানির অপচয় কমাতে পারি, গ্যাসের অপচয় রোধ করতে পারি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবী কেবল আমাদের একার নয়। আমরা মানুষ একটি প্রজাতি মাত্র। এখানে আরও জানা অজানা লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব রয়েছে। তাদের সবার উপস্থিতি আমাদের পৃথিবীর ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সময়ে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সকল জীব ও জড়জগতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার এবং আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীকে সবার জন্য বাসযোগ্য করা।

অনুশীলনী ?

১। তোমার বাসায় সম্পদের অপচয় রোধ করতে কী কী করা যেতে পারে ভেবে দেখো তো?

২। তোমার এলাকায় যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণী বিপন্ন তাদের খুঁজে বের করতে পারবে? তাদের বিলুপ্তি ঠেকাতে কী করা যায় চিন্তা করে দেখো।